Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 701 - 712
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive
OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 701 - 712
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

একটি অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনি : ‘হে পূর্ণ তব চরণের কাছে’

ড. রচনা রায়
সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়
Email ID: rachana.ajkm@gmail.com
iD 0009-0004-8437-2158

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Himalayas, Sadhu-Sant, Shivachrista Swami, Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, Badrinath.

Abstract
Documenting travel experiences seems to be an innate human instinct—a practice that has persisted since ancient times. Beyond merely describing the places, times, and contexts of the journey, the traveler's experiences transform these elements into subjects of both history and literature. Not only in ancient times but also in the twentieth century, Bengali literature has enriched the global canon of travel writing with several memorable works. Prominent among them is ‘Hey Purno Tobo Choroner Kache’ (1985) by Nabaneeta Dev Sen. Although replete with deeply personal details, the book offers a meticulous account of the ‘Char Dham’ pilgrimage, interwoven with the emotions and sentiments of a contemplative heart. Every line of the author's narrative holds elements that satisfy a poet's thirst for beauty, lending this book the stature of fine travel literature. Nabaneeta Dev Sen traveled to various parts of the world in the course of her teaching career, and accounts of these experiences have been penned in several travelogues. She has traveled to the Maha Kumbh and the Char Dham pilgrimage sites in Uttarakhand—not merely for professional reasons, but out of a genuine love for nature and a quest to discover the soul of India. These writings are not simply accounts of travel experiences, descriptions of nature’s beauty, or discussions filled with logistical details; rather, the author’s spontaneous, humorous narrative style captivates the reader with an intense, magnetic pull. They are, at once, travel literature and delightful, light hearted prose.

Discussion

। ১।

হিমালয় এমন এক উত্তুঙ্গ শৃঙ্গশ্রেণী যা ভারতবাসীর কাছে কেবল গিরিশিখর নয়, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। হিমালয়ের কোলে গড়ে উঠেছে বহু বহু তীর্থস্থান এবং অজস্র পুরাণ গল্পগাথা। ভারতীয় বিশ্বাস অনুসারে দেবতাদের

আবাসস্থল হিমালয়। মহাকবি কালিদাস হিমালয়কে বলেছেন ‘দেবতাত্মা’। এই দেবতাত্মার সন্ধানে যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ বহু প্রতিকূলতা, দুঃখ, যন্ত্রণা, শারীরিক কষ্ট অতিক্রম করে পৌঁছে যান যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ ধামে— দেবতার আশীষ লাভের আকাঙ্ক্ষায়। এ চলার বিরাম নেই...। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ৩৬ বছর রাজত্ব শেষে যুধিষ্ঠির পত্নীসহ সকল ভ্রাতাদের নিয়ে যাত্রা করেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। এ পথ সেই মহাপ্রস্থানের পথ। হিন্দুদের বিশ্বাস এ পথের শেষেই আছে জীবনের সমস্ত চাওয়া পাওয়া ও আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি। এ পথ “লক্ষ্য যাত্রীর পদচিহ্ন চর্চিত সহস্রাবদের মৃত্যুহীন পথ ... লক্ষ যাত্রীর নরকঙ্কাল লাঞ্ছিত মৃত্যুলীন পথও বটে।”

চার দেওয়ালের মধ্যে মন যখন আটকে থাকতে চায় না, তখন সে পাড়ি দেয় দূর-দূরান্তে। গৃহের নিশ্চিন্ত আরামদায়ক আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে অজানা পথের উদ্দেশ্যে। পথ যেন তাকে ডাকে। ‘চরৈবেতি চরৈবেতি’ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এগিয়ে চলে অজানাকে জানার আগ্রহে। “ভ্রমণের নেশা এক তীব্র নেশা, প্রায় কৃষ্ণ প্রেমের মত। সে মাদকের সুখ যে একবার আস্বাদন করেছে, সে বারবার সেই আস্বাদ ফিরে পেতে চায়।” আর তা যদি হয় হিমালয়ের টান, তাহলে তো কথাই নেই। হিমালয় আপন সৌন্দর্য, মহিমা ও স্বকীয়তায় যুগ যুগ ধরে সকলকে নিরন্তন আকর্ষণ করে চলেছে। সেই আকর্ষণকে উপেক্ষা করা কঠিন। তীর্থযাত্রী, মুক্তিকামী, ভ্রমণপিপাসু, ভূতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, পর্যটক সকলেই এ পথে আপন অভিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে হিমালয় ভ্রমণের বৃত্তান্তের সংখ্যা কম নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবোধকুমার সান্যাল, জলধর সেন-সহ একাধিক সাহিত্যিক হিমালয় ভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন। এমনকি সত্যজিৎ রায় তাঁর ‘এবার কান্ড কেদারনাথে’ নামক গোয়েন্দা গল্পে (ফেলুদা সিরিজ) কেদারনাথের পার্বত্য হিমালয়ের অপূর্ব যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়েছেন। লক্ষণীয় একই পথের বর্ণনায় প্রত্যেক সাহিত্যিকের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। প্রবোধকুমার সান্যাল ১৯৩২ এর এপ্রিল মাসে কেদার-বদ্রী ভ্রমণ করেছিলেন। ৬৪৪ কিমি পথ পায়ে হেঁটে মোট ৩৮ দিনে তিনি তাঁর গন্তব্যে পৌঁছেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা তিনি লিখেছেন ‘মহা প্রস্থানের পথে’ (১৯৩৭)। এছাড়াও ‘দেবতাত্মা হিমালয়’, ‘উত্তর হিমালয় চরিত’ গ্রন্থে হিমালয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং তাঁর সহযাত্রীদের বিবরণ রয়েছে। হিমালয়কে কেন্দ্র করে রচিত অন্যান্য ভ্রমণগ্রন্থগুলি হল শঙ্কু মহারাজের ‘গঙ্গা যমুনার দেশে’, ‘বিগলিত করুণা জাহ্নবি যমুনা’, বীরেন্দ্র কুমার রায়ের ‘হিমাচলম’, রামানন্দ ভারতীর ‘হিমারণ্য’, উমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘গঙ্গাবতরণ’, অরুণ মুখোপাধ্যায়ের ‘হিন্দু তীর্থ পরিক্রমা’ বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় নবনীতা দেব সেন রচিত ‘হে পূর্ণ তব চরণের কাছে’।

‘মুখবন্ধ’ অংশে লেখিকা পরিহাসের সাথে তাঁর কেদার-বদ্রী ভ্রমণের আকস্মিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। এই অংশে তিনি নিজেকে অর্ধ নাস্তিক হিসেবেও পরিচয় দিয়েছেন। ‘ঈশ্বর নেই’ এই কথাটিতে তাঁর মন সায় দেয় না। আবার ‘ঈশ্বর আছেন’ এটিও তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারেন না। মনের এই দোলাচালতার মধ্যেই তাঁর মনে হয়েছে ‘তিনি আছেন’এবং ‘তিনি আছেন’ বলেই ‘অনবরত অনার্জিত সৌভাগ্যে’ তাঁর জীবন পরিপূর্ণ হয়ে চলেছে। যেমন পূর্ণ হয়েছে তাঁর কেদারবদ্রী ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা। এই যাত্রাকে তাঁর স্বপ্নের মতো মনে হয়েছে। সেই স্বপ্নময় যাত্রার বর্ণনায় নবনীতা দেবী ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের পাশাপাশি হিমালয় ভ্রমণে তাঁর উপলব্ধিজাত আত্মবিশ্লেষণ, আত্ম উপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। বলাবাহুল্য হৃদয়ে-মনে প্রবল ঈশ্বর ভক্তি নিয়ে নবনীতা দেবী চারধাম যাত্রায় নির্গত হননি বরং হিমালয়ের অপার সৌন্দর্যের আকর্ষণ ও তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য তাঁকে যাত্রায় অনুপ্রাণিত করেছিল। সমগ্র রচনাতে দেখা যাবে আধা নাস্তিক লেখিকা বারে বারে হিমালয়ের সৌন্দর্য ও যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা পৌরাণিক ইতিহাসের সম্মোহনে আকৃষ্ট হয়েছেন। আকৃষ্ট হয়েছেন বহু নাম না জানা ঝর্ণার উচ্ছ্বসিত প্রবাহে, ভাগীরথী-অলকানন্দা-মন্দাকিনীর উচ্ছ্বল ফেনিল জলতরঙ্গে, পর্বতের বুক চিরে সূর্যোদয় বা পাহাড়ের অন্তরালে অস্তরাঙা রবির আলোর মোহময় কিরণে। প্রতি পাহাড়ের বাঁকে লেখিকা আবিষ্কার করেছেন হিমালয়ের আধ্যাত্মিক মহিমা, প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্য ও সাধু সন্ন্যাসীদের নিরাসক্ত জীবনযাপন; সেই সঙ্গে মানুষের স্বার্থপরতাও।

একদা লেখিকা তাঁর কিছু প্রিয় মানুষের সঙ্গে এসেছিলেন ঋষিকেশে গুরুর আশ্রমে পুজো দেখতে। সালটা ১৯৮১। এখানে এসেই তাঁর প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল হিমালয়ের বুকে সূর্যোদয় দেখে। তিনি অভিভূত হলেন সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে পূর্ব আকাশে রং পরিবর্তনের মায়াবী খেলা দেখে। লাল টুকটুকে আপেলের মত সূর্যের নরম আলোর স্পর্শে ধ্যানমগ্ন

গুরুগম্ভীর হিমালয় যেন অন্যরূপে লেখিকার সামনে ধরা দিল। শুধু গিরিশ্রেণী নয়, ঋষিকেশের চঞ্চলা কিশোরী গঙ্গা লেখিকার হৃদয় হরণ করল। নবনীতা লক্ষ্য করলেন এ গঙ্গা যেন "নীল ডুরে শাড়ি জরানো ফুটফুটে কিশোরী।" আর কলকাতার গঙ্গা "একজন চওড়া পেড়ে গরদ পড়া গিন্নিবান্নি'র মতো পৃথুলা প্রৌঢ়া। কিন্তু সেবার ঋষিকেশ থেকে অতৃপ্ত মন নিয়ে তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছিল। তারপর থেকেই তাঁর মনে হিমালয়ের নেশা পেয়ে বসে। চারধাম যাত্রার জন্য মনটা আকুলিবিকুলি করতে থাকে। দেবপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগ শ্রীনগর উত্তরকাশী গুপ্তকাশী উখিমঠ নন্দপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ শোনপ্রয়াগ উত্তরাখণ্ডের এই নামগুলি তাঁর কর্ণকূহরের রূপকথার মতো শোনায়। অতএব এই পথে তাঁকে যেতেই হবে, এমন একটা জেদ চেপে বসে মনে। অনেকবার চেষ্টা করেছেন বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু বাঁধা পড়েছে প্রতিবার। তারপর অকস্মাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ এল। বড় মেয়ে পিকোলো ও ভাই রঞ্জনকে নিয়ে উঠে পড়লেন দিল্লিগামী ট্রেনে। বেড়ানোর উত্তেজনায় চেকার আসতে জানা গেল লেখিকা কেবলমাত্র তাঁর টিকিট কেটেছেন, তার সহযাত্রীদের নয়। তবে এই আকস্মিক বিপদ থেকে লেখিকা রক্ষা পেয়েছিলেন নিজস্ব নাম যশের গুণে। নবনীতার বন্ধুর দাদা মিস্টার মুখার্জি ভগবান রূপে আবির্ভূত হয়ে সে যাত্রা তাঁদের 'সসম্মানে উত্তীর্ণ' করে দিয়েছিলেন।

নির্বিঘ্নে দিল্লি পৌঁছানো গেল। এখান থেকে চারধাম যাত্রা শুরু করতে হবে। খোঁজখবর নেওয়া হল বিস্তর। এরই মধ্যে লেখিকার যাত্রাসঙ্গীরা পাহাড় ভ্রমণে অনিচ্ছুক হলেও নবনীতা নাছোড়। অবশেষে অনেক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তারা একখানি মোটর গাড়ি চড়ে রওনা দিলেন ঋষিকেশের উদ্দেশ্যে। হরিদ্বারের গঙ্গা, ঝাউবন আর হিমালয় দেখতে দেখতে এসে পৌঁছালেন ঋষিকেশে। পথে এক বিয়ের মিছিল দেখে লেখিকা বেশ অবাক হলেন। একদিকে প্রাচীন নগর, নিঃশব্দ গঙ্গা আর তার পাশে উদ্দাম চটুল নৃত্যগীতের জুলুস। মুহূর্তে লেখিকার মনে হল এটাই ভারতবর্ষের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। বস্তুত এভাবেই লেখিকা তাঁর যাত্রাপথে ভারতের আত্মানুসন্ধানে নিমগ্ন হয়েছেন। হিমালয়ের সৌন্দর্য, সেখানকার বন জঙ্গল পাহাড় নদী মানব মানবী ঝরনা পাখি প্রজাপতি সবই লেখিকা সরসতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর রচনায়। 'ভারত তীর্থ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন - "নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।" সমগ্র যাত্রাপথে নবনীতা দেবী যেন এই বাণীর সরবত্তা নিরীক্ষণ করেছেন।

ঋষিকেশ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলেন দেরাদুন মুসৌরি। পথে দেখা হল সহস্রধারা জলপ্রপাত। যাত্রাপথের কিছুটা সময় লেখিকাদের সঙ্গে ছিলেন শর্মাজী। তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত ফুর্তিবাজ হাসিখুশি মানুষ। তার সাহচর্য লেখিকাদের যাত্রাকে করে তুলেছিল রসময় ও আনন্দময়।

নবনীতা দেবী পাহাড়ি যাত্রা পথের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। পাশাপাশি উন্নয়নের প্রচেষ্টায় প্রকৃতির ধ্বংস রূপেরও উল্লেখ করেছেন। পাহাড়ি চড়াই উতরাই ও বাঁক যুক্ত পথে অনেকের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, মাথা ঘোরে, বমি হয়। পিকোলোর সেই অবস্থা হল। তাই মাঝে মাঝেই বিরতি নিতে হচ্ছিল। ফুল তুলে, ঝরনার জল মুখে দিয়ে, পাহাড়ি নাম না জানা ফুল ফল সংগ্রহ করে, পাহাড়ি জনপদ, মানুষজন ও প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে পথ চলতে লাগলো সকলে।

এবার গন্তব্য যমুনোত্রী। বারকট নাওগাঁও পার হয়ে পৌঁছানো গেল সায়ন চটিতে। সেখান থেকে হনুমান চটি। গ্রন্থের ১৭ থেকে ৩৩ পরিচ্ছদ পর্যন্ত যমুনোত্রী ভ্রমণের বর্ণনা রয়েছে। যমুনোত্রী যাবার পথে হনুমান চটিতে আশ্রয় নিতে হয়। এরপর বাকি পথটুকু হেঁটে, ডান্ডি, কান্ডি অথবা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যেতে হয়। হনুমান চটি জায়গাটি অপরিচ্ছন্ন, অপরিসর। সরকারের কোন দৃষ্টি নেই এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। না আছে ভালো থাকার জায়গা, না খাওয়ার। জিলিপি পাকোড়া লুচিপুরি পাওয়া যায় বটে তবে তা যথেষ্ট অস্বাস্থ্যকর। লেখিকারা অনেক কষ্টে একটি আশ্রয় জোগাড় করলেন। রাতে অনেক বাঙালির সঙ্গে আলাপ হল। তাদের কেউ সদ্য যুবক, কেউ বিধবা, কেউ সধবা, কেউবা কুমারী অর্থাৎ নানা বয়সের নারী পুরুষ নির্বিশেষে চলেছেন পূণ্যার্জনের পথে – যমুনা মাঈকি দর্শনে।

তীর্থদর্শনে কষ্ট না করলে পুণ্য লাভ হয় না। প্রবল ঠান্ডা, বর্ষা বাদল ও শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে তীর্থযাত্রীরা দলে দলে চলেছেন। লেখিকা ও তাঁর কন্যা চলেছেন খচ্চরের পিঠে আর 'রঞ্জন স্মার্টলি লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের পথে'। একদিকে গভীর খাদ, নিচে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী আর একপাশে খাড়া পাহাড়। 'মাথার কাছে পাথরের চাঁইগুলো ঝুলে আছে।' তবে খচ্চরের পিঠে চড়ে যাওয়া মোটেই সুখপ্রদ ছিল না। এভাবে চললে পথের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না,

নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত থাকতে হয়। চলতে চলতে অবশ্য সহযাত্রীদের অবলোকন করা যায় অনায়াসেই। কত বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র বেশবাস, বিচিত্র আচরণ! পথে চলেছে জাঠ রাজস্থানী যাত্রী, চলেছে সুতির শাড়ি ও কেটস পায়ে বাঙালি রমনী, ট্রেকিং সুট পড়া টাকমাথা তরুণ, কম্বল কাঁধে পুটুলি মাথায় নাগরা পায়ে দলে দলে মানুষ— “যেন শোভাযাত্রা করে চলেছে এই রংবেরঙের মেয়ে পুরুষের গ্রাম্য জনতা।”

ঘোড়া এসে থামলো জানকি চটিতে। এখানে প্রচুর দোকানপাট। খাবারের দোকান। চা খেয়ে ফের যাত্রা শুরু হল। দেখা হল এক পাঞ্জাবী মহিলার সঙ্গে। তিনিও চলেছেন অশক্ত শরীরে, অচৈতন্য দেহাতি বৃদ্ধাও চলেছেন কান্ডি চড়ে। কেউ চলেছেন পদব্রজে, কেউ বা থেমে থেমে গাঁজা খেতে খেতে। এ পথ বড়ই ভয়ানক। প্রবল ঠান্ডা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি আছে, আছে পাহাড়ি খোদাই করা কাদা রাস্তা। কিন্তু সবশেষে আছে দেবতার আশীর্বাদ পাবার পরম সৌভাগ্য।

সবটা পথ ঘোড়ায় যাওয়া যায় না। শেষের দিকে কিছু পথ হেঁটে যেতে হয়। সে পথও অতি দুর্গম। ‘বৃষ্টিপিছল পথ সিঁড়ির মতো বড় বড় পাথর সাজানো কখনো বা ঝরনার ভিতর দিয়ে যাওয়া’। পথের শেষে যমুনোত্রী মায়ের মন্দির। জায়গাটা মোটেই সুন্দর নয় বরং ‘কুশ্রী অপবিত্র নোংরা’। মন্দিরে পুজো দেবার ব্যবস্থা আছে। পুজোর নৈবেদ্য কিনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দামের। তবে পূজার পূর্বে মন্দিরের পেছনে তপ্তকুন্ডে স্নান করতে হয়। প্রকৃতির নিয়মের সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে প্রচন্ড ঠান্ডার পাশে একটি করে তপ্তকুণ্ড আছে। এখানেও আছে। কিন্তু চারদিক বড়ই অপরিচ্ছন্ন। প্রকৃতি যমুনোত্রীকে যত সুন্দর করার চেষ্টা করেছেন মানুষ অনবরত তাকে কুৎসিত করে চলেছে। অন্যদিকে পশ্চিমী সভ্যতার মানুষ তা কখনো করে না। বরং তারা তাকে ‘মানুষের ভোগের উপযুক্ত করে তোলে’। যমুনোত্রীতে এসে বেশ কিছু উপলব্ধি সঞ্চার হয় মনে। শহুরে শিক্ষিত মানুষের যা অবশ্য প্রয়োজন, এখানে সেগুলি কল্পনাতীত মাত্র। এখানে ভালো বাথরুম নেই, বসবার জায়গা নেই, খাওয়ার জায়গা নেই, রাস্তা অপরিচ্ছন্ন - কর্দমাক্ত, অসুস্থ বৃদ্ধ অসতিপর ব্যক্তিদের জন্য কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। অবিলম্বে প্রয়োজন জরুরী সরকারি ব্যবস্থাপনা। যাতে এই জায়গা ব্যবসাসর্বস্ব দমবন্ধ পরিবেশ থেকে প্রকৃতির কোলে এমন এক তীর্থস্থানে উন্নীত হয়, যা ভক্তি, আনন্দ ও বিলাসের সহাবস্থানে হবে আদর্শ মুক্তির ঠিকানা।

যমুনা মাঈকি দর্শনের পর, এবার ফেরার পালা। জানকি চটি পর্যন্ত হেঁটে ফেরা গেল। খাওয়া দাওয়া করা হল। আলাপ হল বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত সাধু-সন্ততের সঙ্গেও। সকলেই নিজের মতো চলেছেন। তাদের যেন কারোর কিছুই চাইবার নেই। মানুষের কাছে হাত পাতবার নেই। এবার একেবারে বারকোট পর্যন্ত এসে থামা হল। এখানে সাময়িক বিশ্রাম। ঘোড়ায় চড়ে গা হাত পা ব্যথা হয়েছে প্রবল। আর কোথাও ঘোড়ায় চড়া যাবে না। অতএব এবারের মতো কেদারনাথ দর্শন বাতিল হল।

পরবর্তী গন্তব্য গঙ্গোত্রী। নতুন পথ। নতুন উদ্দীপনা। নতুন উপলব্ধি। এ পথের সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। বরফমোড়া পাহাড়ের দৃশ্য, ছায়াঘন শীতল পথ। পথে চলেছেন সাধু সন্তরা। তারা যেন সমস্ত জাগতিক মোহমায়া মুক্ত। তাদের সামান্য কম্বলের পুঁটলি। অন্য হাতে ঝুলন্ত জলপাত্র। কেউবা বিশ্রামরত। কেউবা গাঁজা খেয়ে ঝাউবনের ছায়ায় চিৎপাত। কিন্তু এরাই এই পথকে করেছে তীর্থযাত্রার উপযুক্ত।

বারকোট থেকে ধারাসু। তারপর উত্তরকাশী। এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে দুধ সাদা ফেনিল উচ্ছ্বসিত চঞ্চলা ভাগীরথী। উত্তরকাশীতে রাত্রি বাস করে পরদিন গাঙ্গনানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হবে। উত্তরকাশীর দৈবী মহিমাও কম নয়। এখানকার গৈরিকা গঙ্গা ঋষিকেশের স্বচ্ছ তরুণীটির চেয়ে বহু গুণে চঞ্চলা। উত্তরকাশীর পর উখি মঠ। পথের দুধারে সাধুদের আশ্রম। উখি মঠ পৌরাণিক স্থল। কথিত আছে ঊষা-অনিরুদ্ধের ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল এই স্থানে। উত্তরকাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজো দিলেন সকলে। রাত্রে দেখা হল যমুনোত্রী থেকে আগত কিছু যাত্রীদের সঙ্গে। তাদের মুখ থেকে জানা গেল প্রবল বৃষ্টিতে দুটি বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটা বাচ্চা মেয়ে ও একজন পাঞ্জাবি মহিলা ঘোড়া শুদ্ধ খাদে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন। ঘটনা দুটি হৃদয়বিদারক। তীর্থ করতে এসে বেঘোরে দুটি প্রাণ চলে গেল।

উত্তরকাশী থেকে সোজা হিমালয় শিখার অভিমুখে যাত্রা শুরু হল। গন্তব্য গঙ্গোত্রী। এ পথের সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। পথের একপাশে খাদের মধ্য দিয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে ফেনিল ভাগীরথী বয়ে চলেছে যেন ‘হিমালয়ের সাদা ভেড়ার পাল যাচ্ছে’।

পথের পাশাপাশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গাড়ওয়ালী গ্রাম। সেখানে প্রবাহিত তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা। পথ চলতে চলতে সরকারি উন্নয়নের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। তৈরি হচ্ছে মানোরী হাইড্রা প্রজেক্ট। কিন্তু অসচেতনতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারিদিকে। মৃত পশু দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ করলেও তা সরানোর তৎপরতা দেখায় না কেউ। পাবলিক হেলথ বিষয়ে পরিপূর্ণ অসচেতনতার প্রবল দৃষ্টান্ত চারিদিকে। মানোরী ভাটওয়ারী পার করে গাঙ্গনানী। মনোরম পথ। মাঝে মাঝে পাহাড়ি ছাগল ভেড়া পথ আটকাচ্ছে। পথে চলছে কত ধরনের মানুষ। তবে প্রকৃতির মত মানুষের মন উদার নয়। জাতিভেদ প্রথা প্রবল। জাঠ গুরজ ছেত্রী গাড়োয়ালী বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবল বিদ্বেষ। পথে ভাটোয়ারীতে বৃদ্ধ ইন্দোর সিংয়ের দোকান থেকে চা খাওয়া হল। লোকটির সারল্য মুগ্ধ করে।

গাঙ্গনানী পার হতেই পথে চেহারা বদলে গেল। কাঁচা রাস্তায় নুড়ি পাথর ধুলো কাদা আর পথে ঝর্ণার পর ঝর্ণা, ঝরনার জল ঠান্ডা আর মিষ্টি। পথের সৌন্দর্য উপভোগ্য। তবে মাঝে মাঝে রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে। নির্দিষ্ট সময়ে লংকায় পৌঁছানো গেল। আপাতত মোটরের রাস্তা শেষ। তিন কিলোমিটার ট্রেকিং করে যেতে হবে। তারপর আবার মোটরের রাস্তা মিলবে। এখানেই রাত্রিবাসের পরিকল্পনা। তীর্থযাত্রীরা যে যার মতো খাওয়া-দাওয়া ও রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। এখানে সকলেই দরিদ্র। যে যত সস্তায় পারে ব্যবস্থা করছে। কিন্তু ভালো থাকার জায়গা নেই কোথাও। তাই লেখিকারা গঙ্গোত্রীতেই চলে গেলেন। যাবার পথে চোখে পড়ল মৃতদেহ আগলে বসে আছে এক রাজস্থানী মহিলা। পুলিশের কাছ থেকে জানা গেল, এ ঘটনা এ পথে নিত্যই ঘটে থাকে! তবু এ পথে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা কমে না। তীর্থভ্রমণ চলতেই থাকে।

যমুনোত্রী থেকে গঙ্গোত্রীর বিস্তর পার্থক্য। 'যমুনোত্রীর বন্যতা যদি হয় সাবলাইম, গঙ্গোত্রীর সভ্যতা তাহলে বিউটিফুল।' এখানে খচ্চরের তেমন উৎপাত নেই। যেটুকু আছে সেগুলি ভারতীয় সেনাদের সেবায় নিযুক্ত। সামনেই ভারত তিব্বত সীমান্ত। ভারতীয় সেনারা সেখানে সশস্ত্র পাহারায় রত। ভৈরবঘাঁটির কাছাকাছি গঙ্গা যমুনার মিলনস্থল। 'সেখানে দুই রঙের দুটি নদী প্রচন্ড বেগে এসে মিশেছে। একটি নীল অন্যটি গেরুয়া।' রংয়ের বিভাজন স্পষ্ট। নদীর পাথরগুলিও অদ্ভুত গড়ণের। ভৈরবঘাঁটিতে ভৈরব মন্দির আছে। এখান থেকে ভিড়ে ঠাসা বাসে অনেক কষ্টে গঙ্গোত্রীতে পৌঁছানো গেল। এখানে টুরিস্ট লজে থাকবার ব্যবস্থা। এখানকার গঙ্গামাঈকি মন্দিরটি বড় সুন্দর। "প্রাঙ্গণটি পরিছন্ন। চারিদিকে ছোট ছোট অনেক মন্দির। তাদের সামনে বারান্দা আছে। বসবার জায়গা আছে। যাত্রীরা পুঁটুলি বোচকা নিয়ে বসে আছে মন্দির প্রাঙ্গণে।" এখানে এসেই দেখা হল কবি কবিতা সিং ও তার মেয়ে ঘুচাইয়ের সঙ্গে। সকলেই এতে আহ্লাদিত। সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি হয়। বেশ সুন্দর। লেখিকা লক্ষ্য করলেন মন্দিরে দক্ষিণ ভারতীয় বৃহদাকার ভেঁপু বাজছে। তিনি শুনেছেন বদ্রীনাথের মন্দিরে কেরালার নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ পূজারী হন। এভাবেই ভারতের উত্তর আর দক্ষিণপ্রান্ত যেন এক সূত্রে বাঁধা হয়ে আছে।

গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার উৎপত্তি। আরেকটু এগিয়ে গেলেই গোমুখ। সেখানকার গ্লেসিয়ার থেকে গঙ্গার জন্ম। কিন্তু ভারতীয় বিশ্বাস মতে গঙ্গার উৎপত্তি মহাদেবের জটাজাল থেকে। গঙ্গার উৎসদেশে এসে লেখিকার মনেও একই অনুভূতির অনুরনন হল —

> "গঙ্গাতীর থেকে ফিরে এসে ট্যুরিস্ট লজেই খেয়ে নিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছি। পিছনের পর্বতের বিপুল ছায়ার দিকে তাকিয়েই হঠাৎ স্পষ্ট দেখলুম শিবের মাথায় চাঁদ। হিমালয়ের বিরাট অন্ধকার ছায়াশরীরের মাথায় এক সম্পূর্ণ রুপোর তৈরি চাঁদ উঠেছে। মুহূর্তেই পুরাণের চিত্রকল্পটির সত্যতা চোখের উপর প্রমাণিত হয়ে গেল। ছায়ার নীচেই গঙ্গার ঝিকঝিক্ কুলুকুলু। — "নদী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? মহাদেবের জটা হইতে।"[১]

পরদিন সামনে উদ্ভাসিত হল 'ধ্যানস্ত শান্ত ভোরের হিমালয়'; তার নিচে উত্তাল গৈরিক গঙ্গার স্রোতধারা। ভোর বেলায় মন্দিরে আরতি হয়। পুজো হয়। এখানে শুধু গঙ্গা দেবীর পূজা হয় না, গঙ্গা নদীরও উপাসনা হয়। নদী তীরে পান্ডারা যাত্রীদের পুজোয় সাহায্য করে, যাগ-যজ্ঞ তর্পণ পিণ্ডদান নানারকম ধর্মীয় কার্যকলাপ চলে সেই সকালবেলা থেকে। প্রবল

ঠান্ডার মধ্যেও মানুষ পুণ্যলোভে নদীতে স্নান করেছে। ঠান্ডার ভয়ে লেখিকা স্নান করলেন না কেবল পুণ্য বারি মাথায় ছিটিয়ে নিলেন। বিনম্র শ্রদ্ধায় শ্বশুর ও পিতৃকুলের প্রতি তর্পণ করলেন।

গঙ্গোত্রীতে পরিচয় হল শিবখ্রীষ্ট স্বামীর সঙ্গে। ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মকে ভালোবেসে তিনি বিদেশ থেকে এখানে চলে এসেছেন। এসেছেন ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষের সেবার জন্য। সরল বিশ্বাসী এই সাধু পিকোলোর হাতে একটা নোংরা খামের মধ্যে আড়াই হাজার টাকা গচ্ছিত রাখতে দিলেন। পরে প্রয়োজনমতো নিয়ে নেবেন। ভারতবর্ষের গরীব শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রম তৈরি করা তার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য সে টাকা জমিয়ে জমি কিনে আশ্রম করবে। লেখিকাদের কেদারনাথ যাবার কোন অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু এই সাধুর উৎসাহে শেষপর্যন্ত কেদারনাথে যাবেন বলে মনস্থির করলেন।

। ২।

‘হে পূর্ণ তব চরণের কাছে’ গ্রন্থটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথমার্ধে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বর্ণিত আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ। ভারতের যতগুলি হিন্দু তীর্থস্থান আছে উত্তরাখণ্ডের এই চার ধাম তার মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এই মন্দিরগুলি পাহাড়ের সুউচ্চস্থানে অবস্থিত। বহু শারীরিক কষ্ট অতিক্রম করে এইসব দুর্গম স্থানে পদার্পণ করতে হয়। শত শত বছর ধরে পুণ্যার্থীরা এই কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করে দেবতার আশীষ প্রার্থনায় চলেছেন। নবনীতা দেবী ভক্তির ভাবালুতায় চারধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা না করলেও ক্রমশ হিমালয়ের স্নিগ্ধ শান্ত তুষারধবল মৌন প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি দেবতার পায়ে মাথা নত করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে দেবতার চরণতলে আশ্রয় নিলেই জগতের আনন্দযজ্ঞে শামিল হওয়া সম্ভব। হয়তো সে কারণে লেখিকা তাঁর হিমালয় ভ্রমণের নামকরণ করেছেন - ‘হে পূর্ণ তব চরণের কাছে’।

যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, বদ্রীনাথ ভ্রমণ শেষে তাদের কলকাতা ফিরে যাবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু গঙ্গোত্রীতে তাঁদের সঙ্গে এক বিদেশি সাধুর পরিচয় হয় যার উৎসাহে শেষ পর্যন্ত তাঁরা কেদারনাথ যাবার পরিকল্পনা করেন। গঙ্গোত্রী থেকে প্রথমে ফিরতে হল উত্তরকাশী। গৈরিক গঙ্গা বয়ে চলেছে এই উপত্যাকার উপর দিয়ে। উত্তরকাশী থেকে বদ্রীনাথে পৌঁছাতে শ্রীনগর পার করে সবার আগে আসতে হয় রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ নামটি আপামর ভারতবাসীর কাছে পরিচিত। জিম করবেট এখানেই হত্যা করেছিলেন সেই কুখ্যাত নরখাদক লেপার্ডটিকে। যাইহোক, এখান থেকে দুই তীর্থস্থানে যাবার পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে লেখিকাদের গন্তব্য বদ্রীনাথ। সাধারণত কেদারনাথ হয়ে বদ্রীনাথ যাবার চল। কিন্তু লেখিকারা প্রথমেই যাবেন বদ্রীনাথ। রওনা হলেন। কত অজানা অচেনা গ্রাম, কত অজানা অচেনা নদী দেখতে দেখতে চলেছেন। কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, চামোলি, পিপলকোটি পার হয়ে যোশিমঠ। এখানে জগৎগুরু শ্রীমদ্ শংকরাচার্যের একটি মন্দির রয়েছে। এছাড়া সারা পথ জুড়েই আছে কত শত ছোটখাট মন্দির ও ধর্মস্থান। লেখিকার মনে হয়েছে পারিবারিক বন্ধন ও দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিয়ে একা এলেই হিমালয় ও তার মহিমাকে যথার্থ উপলব্ধি করা যায়।

যোশীমঠ একদিকে যেমন বদ্রীনাথ যাবার প্রধান ফটক, তেমনি আবার নানা রকম হিমালয় অভিযান এখান থেকেই শুরু হয়। যাকে বলে পর্বতারোহনের বেস ক্যাম্প। এখান থেকে থেকে সাত আট মাইল পরই আছে শিখদের পরম পবিত্র ধর্মস্থান গোবিন্দ ঘাট। ঋষিকেশ থেকে শিখ তীর্থ যাত্রীরা হেঁটে হেঁটে চলেছেন গোবিন্দঘাটের দিকে। পথে থামতে থামতে, বিশ্রাম নিতে নিতে, গান গাইতে গাইতে। সব বয়সী নারী পুরুষের দল চলেছেন মহাতীর্থ গোবিন্দ ঘাটের উদ্দেশ্যে। সারা বছরই বহু মানুষ এ পথে যাতায়াত করেন। গোবিন্দ ঘাট যাবার পথে পড়ে ‘ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারর্স’ — ফুলের নন্দন কানন। প্রতিবছর জুলাই আগস্ট মাসে এ অঞ্চলে ভিড় জমান প্রকৃতি প্রেমিক পর্যটকেরা। পথ অতি দুর্গম; তবুও বাধা মানেন না কেউ।

যোশীমঠ পৌঁছে জানা গেল বদ্রীনাথে বাস স্ট্রাইক চলছে, তবে তাদের অসুবিধা নেই, তারা চলেছেন গাড়িতে। বরং বদ্রীনাথ যাবার জন্য একজন ছোকরা পুলিশ তাদের গাড়িতে উঠে পড়ল। পথে দেখা গেল একটি বাস ত্রিশঙ্কু হয়ে বিপদজনক হয়ে প্রায় ১০ দিন ধরে ঝুলে রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এতদিনেও কেউ বাসটিকে সরানোর ব্যবস্থা করেনি।

পুলিশ সহ এখানকার মানুষের ধারণা 'ওখানটাতে এক আত্মা আছেন তিনি এই টানাটানিটা করেন'। এমন কাণ্ডকারখানা দেখে নবনীতা দেবী ড্রাইভারকে সাবধানে গাড়ি চালানোর অনুরোধ জানিয়ে বললেন—

> "সুরথ সিং, সাবধানে চালিও ভাই, কে জানে কোথায় কোন্ আত্মাকে খুঁচিয়ে দেব। শেষে ঠেলা মেরে দেবে। সব আত্মা তো সাধু-মহাপুরুষের নাও হতে পারে!"[২]

বদ্রীনাথের দিকে যত এগনো যাচ্ছে দেখা মিলছে বরফের। বরফের দেওয়াল, অপূর্ব তুষার গুহা, তুষার ঝর্ণাধারা আর বরফের জাফরী কাটা জালির কাজ। সব প্রকৃতির খেয়ালে তৈরি। গাড়ি থামিয়ে সকলে বরফের মজা নিলেন বরফের মধ্যে লুটোপুটি করে। একদিকে পাহাড় আর অন্যধারে অলকানন্দার ফেনিল স্রোত। বরফের নিচে দেখা যাচ্ছে অন্তঃসলিলা হিমবাহ!

বদরিকা আশ্রম। যার প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে পুরাণ। কথিত আছে ব্যাসদেব এই স্থানে বসে শ্রীগনেশের সহায়তায় মহাভারত রচনা করেছিলেন। বদ্রীনাথের মূল মন্দিরে ভগবান নারায়ণ পূজিত হন। ফলে মন্দিরের মাইকে রামভজন চলছে অনবরত। লেখিকারা এখানে আশ্রয় নিয়েছেন বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে। এখানে খাবারের বন্দোবস্ত নেই। সামনের হোটেলে গিয়ে খেতে হবে। ভাতের হোটেলটি চালায় একজন বাঙালি মহিলা। তার সুচারু নির্দেশনায় ব্যবসা খুব ভালো চলছে। বিদেশ বিভূঁইয়ে একজন বাঙালি মহিলার এই 'বাণিজ্য প্রয়াস' সত্যই প্রশংসনীয়।

মন্দির চত্বরের কাছাকাছি ছোটখাটো বাজার রয়েছে। নানা জিনিস সেখানে বিক্রি হয়। শাল, কুমকুম, পুতির মালা, সিন্দুর, সিন্দুরকৌটা, তামা-পেতলে আংটি, চারধামের মহিমা সংকলিত ছবির বই, ছোট বড় জলের ঘটি, আরো কত কি! খাবারের দোকানে রয়েছে বিস্তর। আর রয়েছে ভিখারিদের দৌরাত্ম্য। লেখিকার বক্তব্য 'বদ্রীনাথে ভিখারিদের আর পান্ডাদের রাজত্ব'। মন্দিরে পৌঁছতে হলে অলকানন্দা পার হয়ে হতে হয়। সেই সেতুতে ওঠার আগে থেকেই ভিখারিদের লাইন।

> "একজন ভিখিরি আবার যে-সে ভিখিরি নয়। তাদের ছোটখাটো ব্যবসা আছে। বাটা নিয়ে খুচরো জোগান দেয় তারা যাত্রীদের, এক টাকার খুচরো নিলে ১৫ পয়সা বাটা লাগে। সেইসব খুচরো আবার ভিখিরিদের থালায় ফেরত যায়।"[৩]

লেখিকার পর্যবেক্ষণ যে যথার্থ তা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন।

তীর্থস্থান সাধু সন্ন্যাসীদের আস্তানা। তাদের কেউ আসল, কেউ বা নকল। কেউ ধুনি জ্বালিয়ে ব্যোম হয়ে বসে আছে। কেউ মালা, পাথর, আংটি বা নানা শেকড় বাকড়, জরিবুটি সামনে রেখে বিক্রি করছে। লেখিকাদের সঙ্গে এমনই এক সাধুর সাক্ষাৎ হল। তিনি রঞ্জন, পিকোলো আর নবনীতা দেবীকে নানান উপদেশ দিলেন এবং আশ্চর্য কিছু কথা বললেন। সাধুর আচরণে তাৎক্ষণিকভাবে সকলেই মুগ্ধ।

বদ্রীনাথ থেকে তিন মাইল দূরে মানা গ্রাম। গ্রামটি ছবির মত সুন্দর। এখানে আছে ব্যাসদেবের তপস্যাস্থান 'ব্যাসগুহা'। আর আছে সরস্বতী নদীর উৎসস্থান। এগুলি পার করে বসুধারা জলপ্রপাত। এর পাশ দিয়েই চলে গেছে স্বর্গারোহণের পথ, যে পথে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। মানা গ্রামে বিভিন্ন উপজাতীয় শ্রেণির মানুষের বাস। উলবোনা, কম্বলবোনা আর শাল তৈরি করা এদের জীবিকা। মানুষ কত কষ্টে, কত পরিশ্রম করে প্রকৃতির দুর্গমতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে, এদের দেখলে তার প্রমাণ মেলে।

রাতে বদ্রীনাথের আকাশ আলো করে এক 'সর্বগ্রাসী চাঁদ' উঠল। মুহূর্তে পাল্টে গেল বদ্রীনাথ উপত্যকার সৌন্দর্য। নীলকণ্ঠ পর্বত নর আর নারায়ণ পাহাড়কে পাশে নিয়ে উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুষারাবৃত্ত নীলকণ্ঠ চন্দ্রলোক স্নাত হয়ে দন্ডায়মান হয়ে রইল সারারাত্রি।

বদ্রীনাথের মন্দিরের পাশেই আছে তপ্তকুণ্ড। একেবারে হিমশীতল অলকানন্দার গা দিয়েই উঠে এসেছে তপ্তকুণ্ড। সেখানে স্নান করে ব্রহ্মশিলায় পিতৃতর্পণ করে বদ্রীনারায়ণ দর্শন করতে হয়। স্নানের জন্য রয়েছে নারী পুরুষের পৃথক ব্যবস্থা। তবু মেয়েদের আব্রু নিবারণের যথাযথ ব্যবস্থা নেই। তারই মধ্যে গরম জলে স্নান সেরে নিচ্ছে সকলে। লেখিকাও স্নান সেরে পিতৃ তর্পণের ব্যবস্থা করে নিলেন। পিতৃতর্পণ বিষয়টিকে বড় আবেগে লেখিকা ব্যাখ্যা করেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 701 - 712
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "কি আশ্চর্যই লাগে আমাদের এই পিন্ডদানে রীতিটাকে আমার। সব সুন্দর জায়গাতেই আগে আমরা ঈশ্বরের পীঠস্থান রচনা করি, আর ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়াতে গেলে আমরা একবার শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে নিই আমাদের জন্মের কারণকে। জন্মদানের জন্য। ...পিণ্ডদান, পূর্বপুরুষকে তৃষ্ণায় জলদান এই যে অচ্ছেদ্য যুগযুগান্তের মধ্যে যোগাযোগ সংরক্ষণ, এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা আত্মিক সৌন্দর্য আছে! নম্রতার, কৃতজ্ঞতার একটা শোভা আছে। ...পিণ্ডদানের ব্যবস্থাটা মানুষকে কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেয়, নিজেকে ছাড়িয়ে অন্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার শিক্ষা দেয়। বদলে কিছুই পাওয়া যাবে না জেনেও কিছু দেওয়ার শিক্ষা দেয়।"[৪]

লেখিকার বক্তব্য আমাদের বিস্মিত করে। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে এইসব প্রথাকে আমাদের ভন্ড বা কুসংস্কার বলে বোধ হলেও এর যে একটি নান্দনিক ও শিক্ষণীয় বিষয় আছে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। লেখিকা পেরেছেন। পেরেছেন বলেই অলকানন্দার সেই রূপরাশির মধ্যে পূর্বপুরুষকে স্মরণ করে আপন জন্মের সার্থকতা সন্ধান করেছেন।

মন্দিরে পূজো দিয়ে মন ভরেনি। বদ্রীনারায়ণকে ভালোভাবে দর্শন করা যায়নি পান্ডাদের তাড়নায়। যাইহোক মন্দির থেকে বেরিয়ে চত্বরে এসে দাঁড়াতেই নবনীতা দেখলেন ভিখারিদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই অনুধাবন করলেন একজন বিত্তশালী পৃথুলা মাড়বারবাসিনী পুণ্য সঞ্চয় এর উদ্দেশ্যে ঝুড়িতে করে বিশালাকার লাড্ডু ও জিলাপি বিতরণ করছেন ভিখারিদের মধ্যে। নবনীতা দেবী কালবিলম্ব না করে ভিখারিদের পাশে বসে পড়লেন। অপেক্ষায় রইলেন আসল গাওয়া ঘি এর তৈরি লাড্ডু আর জিলিপির। হঠাৎই পিকোলো এসে তাকে জোর করে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গেল। দেখা গেল দিদিকে অনুসরণ করে রঞ্জনও ভিখারিদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কারোর কপালেই সেই অমৃততুল্য মিষ্টান্নখণ্ড জুটলো না। তারা ফিরে চললেন তাদের আস্তানার পথে।

এবার বদ্রীনাথ থেকে নেমে আসতে হবে। গন্তব্য কেদারনাথ। যোশীমঠ হয়ে নন্দপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ পার হয়ে চললেন। বিকেলের মায়াবী আলোয় চারিদিকে যেন 'মন খারাপ করা আলো' পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেল নদীর বুকে। তিনধাম তীর্থ হয়ে গেল। হিমালয়ের সৌন্দর্য যেমন উপভোগ করা গেল, তেমনি হিমালয়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি হল। এত সৌন্দর্যের মধ্যেও লেখিকার ব্যক্তি হৃদয়ের বেদনা যেন উছলে উঠলো। নবনীতা দেবী জীবনে একজন সফল মানুষ। তিনি খ্যাতনামা লেখিকা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপিকা। তাঁর স্বামী স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন। পিতা-মাতা বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিক। দুই কন্যা নিয়ে তাঁদের সুখের সংসার হতে পারত। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তিনি থাকেন না। বিবাহ বিচ্ছিন্না হয়ে দুই মেয়ে ও মাকে নিয়ে থাকেন কলকাতায়। বাড়িটির নাম 'ভালো-বাসা'। অথচ তাঁর জীবনে একমাত্র অভাব ভালোবাসা। আজ এই হিমালয়ের উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে এসে তাঁর হৃদয়ে জেগেছে বিষন্নতাবোধ; অনন্ত একাকিত্বের যন্ত্রণায় তাঁর হৃদয় হয়েছে বেদনার্ত —

> "এত ভালো লাগার মতো জায়গা, অথচ কেন যেন সম্পূর্ণভাবে আমার করে নিতে পারছি না। কী যেন নেই। কী থাকা উচিত ছিল? কে থাকলে ভালো হত?"[৫]

ব্যক্তি হৃদয়ের উদ্বেলতা যেন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে। কিন্তু একাকিত্বের যন্ত্রণা চেপে বসলে তো চলবে না! তাঁর অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য-কর্ম। অতএব নিজের মনকে আবার নিজেই সংযত করেন।

> "যার জীবনে মানুষ নয়, ঈশ্বরই প্রথম তার কোনো অপূর্ণতা নেই। সে-ই সুখী। কারুর জীবন প্রথমতম হয়ে ওঠার তৃষ্ণা তাকে কুরে কুরে খায় না। যত ঝামেলা এই পালকবিহীন দু'পেয়ে প্রাণীটির বেলায়। কে নেবে আমার এই মুগ্ধতার ভাগ? কাকে দেব এই নন্দপ্রয়াগের স্তব্ধ সৌন্দর্য? তোমার একার সম্পত্তি বলে মেনে নিতেই বা অসুবিধা কিসে? তাঁর অনেক আছে, তিনি তো তোমাকে এটুকু দিতেই পারেন। সবকিছু ভাগাভাগি করে নিতে হবে কেন মানুষেরই সঙ্গে? নবনীতা, বুকের পাত্রটি বাড়াও, বাড়াও। বুকের ভেতর এই অলৌকিক আকাশ-বাতাস, অরণ্য-পর্বত, নদী নির্ঝর, সব ভরে নাও, সব সঙ্গে নাও। ভাগ দেবার সময় অনেক পড়ে আছে।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 701 - 712
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা হয়তো এমন করে আত্মশক্তি অর্জন করতে পারতাম না। কিন্তু নবনীতা দেবী আমাদের সেই আত্মশক্তি সঞ্চিত করবার উপায় বাতলে দিলেন। নিজে বাঁচ, অন্যকে বাঁচাও, ভবিষ্যতে প্রজন্মকে বাঁচতে সাহায্য করো।

হিমালয়ের পথে পথে ছড়িয়ে রয়েছে নানা পুরাণ ইতিহাস কল্পনাসমৃদ্ধ গল্পকথা। ছড়িয়ে রয়েছে মুনি ঋষি তপস্বীদের আস্তানা। তেমনি এক গুহা চোখে পড়ল কর্ণপ্রয়াগের সঙ্গম ছাড়িয়ে অলকানন্দার তীরে। সেখানে পৌঁছাবার কোন সিঁড়ি নেই। একটু এগোতেই দেখা মিলল আর একটা গুহার। 'মুনিঋষিদের নিষ্ঠাবান সহজ জীবনের স্মৃতি বহন করে পড়ে আছে গুহা দুটি'। মুহূর্তে লেখিকা অনুভব করলেন সংসার বিমুখ জীবনের সার্থকতা। লেখিকার এই অনুভব কেবল লেখিকার একার নয়; লক্ষ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে বহু মানুষেরই এমন মনে হয়। সংসার জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা উপেক্ষা করে শরণ নিতে হবে সেই মহান মহাত্মা শক্তির কাছে, যিনি প্রতিদিন পুতুলের মত আমাদের সংসার রঙ্গমঞ্চে সকলকে নাচিয়ে চলেছেন। হিমালয়ের সান্নিধ্যে যে ঔদার্য্য আছে, যে মহত্ব আছে, যে বিশালতা আছে, সেই পূর্ণতার কাছে পৌঁছতে গেলে সেই অদৃশ্য মহাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ভিন্ন গতি নেই। এই জন্যই হিমালয়কে মহাকবি কালিদাস 'দেবতাত্মা' বলেছেন। আমরা কেউই নিরাশ্রয় নই, নির্বন্ধ নই, নিঃস্ব নই, নিঃসঙ্গ নই, একাকী নই। আমাদের জীবন তরী বয়ে নিয়ে চলেছেন এক সর্বশক্তিমান। মানুষের শক্তিমত্তা তাঁর কাছে ক্ষুদ্র। তাই সেই সর্বশক্তিমানের কাছে নির্ভর করেই আমাদের চলতে হবে। লেখিকার ভাববিহ্বলতা আর রবীন্দ্রনাথের অনুভব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে—

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই॥
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে—
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।
অন্তরগ্লানি সংসারভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই॥"[৭]

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছাতে রাত্রি হয়ে গেল। গাড়োয়াল মন্ডল বিকাশ টুরিস্ট লজে থাকা। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথের পথে যেতে প্রয়াগের কাছে দেখা হল হেলথ ডিপার্টমেন্টের লোকেদের সঙ্গে। কলেরার টীকা ব্যতীত কেদারনাথে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অথচ ওদের কারোরই কলেরার ইনজেকশন নেওয়া নেই। অগত্যা নানা মিথ্যার ফুলঝুরি দিয়ে সাজানো কথায় অবশেষে সকলে ইনজেকশনের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে চললেন রুদ্রপ্রয়াগের সঙ্গম দেখতে। অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর মিলনস্থলের পাশে রয়েছে একটি ছোট্ট সাদা মন্দির মন্দির। মন্দিরের ঝুল বারান্দা থেকে নদী দুটিকে খুব সুন্দর দেখা যায়। একটির জলের রং নীল আর অন্যটির গেরুয়া। একটি উচ্ছ্বল অন্যটি শান্ত। মন্দাকিনী শান্ত আর অলকানন্দা উদ্যাম। মন্দাকিনীর পথ ধরেই কেদারনাথের পৌঁছাতে হবে।

রুদ্রপ্রয়াগ, তিলওয়াড়া, অগস্তমুনির পরে এসে পৌঁছতে হয় গুপ্তকাশী। স্থানটির পৌরাণিক মহিমা অপরিসীম। এরপর শোনপ্রয়াগ। শোনগঙ্গা আর মন্দাকিনীর মিলনক্ষেত্র। এখান থেকে যেতে হবে গৌরীকুন্ড। এরপর বাকি চৌদ্দ মাইল পায়ে হেঁটে বাবা কেদারনাথের স্থানে পৌঁছতে হবে। শোনপ্রয়াগ থেকে ৬ কিলোমিটার পথ গেলে আসে ত্রিযুগী নারায়ণ। কথিত আছে—

> "ত্রিযুগীনারায়ণে যজ্ঞাগ্নির শিখা অলিম্পিকের শিখার মতো অনন্তকাল জ্বলমান। ওটি প্রজ্বলিত হয়েছিল শিব-পার্বতীর বিবাহযজ্ঞে। সেই থেকে সমানে জ্বলছে। তিন যুগ কেটে এখন ঘোর কলি যুগ। পবিত্র হোমানল তিন যুগ ধরেই জ্বলছে, তাই ত্রিযুগীনারায়ণ নাম। পুণ্যার্থীরা হেঁটে দেখে আসেন বাবার বিয়ের যজ্ঞাগ্নি।"[৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 701 - 712
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গৌরীকুন্ডের যাবতীয় কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছে একটি বিরাট উষ্ণ নির্ঝর তপ্তকুন্ডকে ঘিরে। এখানেই পাহাড়ের ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে হোটেল, টুরিস্ট লজ, ধর্মশালা। লেখিকারা এসে আশ্রয় নিলেন টুরিস্ট লজে। এখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত নেই। খাওয়া হবে পাশের 'সুনীল লজে'। গৌরীকুন্ডু থেকে পদব্রজে বা ঘোড়া, কাণ্ডী, ডান্ডি করে কেদারনাথে যেতে হয়। পথ খুবই সংকীর্ণ, পিছল ও বিপজ্জনক। একপাশে খাড়া পাহাড় আর অন্যধারে সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে খরস্রোতা মন্দাকিনী। বর্তমানে বর্ষার জল পেয়ে মন্দাকিনী ফুলে ফেঁপে 'গর্জে নেচে ধেয়ে' চলেছে।

কেদারনাথ যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি নেওয়া হল। ঘোড়া পাওয়া গেল সুনীল লজের মালিকের কাছ থেকে। তিনি নিজেই যাবেন ঘোড়া নিয়ে। এবার খচ্চর নয়, ঘোড়াতেই যাওয়া হবে। পিকো আর নবনীতা দেবী ঘোড়ায় উঠলেন। রঞ্জন পায়ে হেঁটে উঠবে। সঙ্গে ওর বন্ধু অলক আছে। পথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে চলেছে সবাই। রাস্তার ধারে প্রচুর গুচ্ছ গুচ্ছ লতাপুষ্প ফুটে আছে। কখনো গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। মিলিটারিরা নিয়মিত বরফ সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার রাখছে। চলতে চলতে অর্ধেক পথ পার হল। রামওয়ারা চটি। এখানে কয়েকটি ধর্মশালা ও গেস্ট হাউস আছে। এখান থেকে তুষারমৌলি শৃঙ্গগুলি অপূর্ব দেখায়। উপত্যাকার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী মন্দাকিনী। প্রকৃতি যেন এখানে তার সমস্ত সৌন্দর্য উজাড় করে দিয়েছে।

চলতে চলতে আলাপ হল এক দন্ডধারী সাধুর সঙ্গে, নাম তার মাধোদাসজী। নবনীতা দেবীর সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলতে বলতে তারা চলছে। কিন্তু হঠাৎই সাধু বাবা তার বয়স মাত্র উনিশ বছর বলায় ১৩ বছরের ঘোড়া চালক লাছমন খুব ক্ষেপে গেল। সাধুবাবার বয়স অল্প বটে, তবে ১৯ বছর নয়। মুহূর্তে দুজনের মধ্যে বাগবিতন্ডা বেঁধে গেল। একজন সাধুর নিজের বয়সের প্রতি এই দৌর্বল্য সত্যই বিস্ময়কর!

রামওয়ারার পর গড়ুর চটি। এখানে সামান্য বিশ্রাম নিচ্ছে অনেকেই। এর পরে আসে দেওদেখানি। এখান থেকে দূরে তুষারশৈল বলয়ের মধ্যে কেদারনাথের মন্দির দেখা যায়। সকলে এখানে কেদারনাথের জয়ধ্বনি দেয় সমস্বরে। কালিকম্বলীবালা ধর্মশালাতে যাওয়া হল। কিন্তু সেখানকার ঘর পছন্দ হল না। অবশেষে অনেক হাঙ্গামা শেষে কবি কবিতা সিংহের দৌলতে (আদতে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে) বিড়লা ধর্মশালাতে আশ্রয় জোগাড় করা হল। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালো। তবে নিরবচ্ছন্ন সুখ রইলো না। একদল ফিল্ম ইউনিটের লোকজনের হৈ হুল্লোরে তাদের শান্তি কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হল।

সাধারণত বিকেলে এখানে প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। বিড়লা গেস্টহাউসটি মন্দিরের পাশেই। রাত হয়ে গেছে। বাইরে প্রবল ঠান্ডা। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ফুটফুটে জোৎস্নায় হিমালয়কে আরো মোহময়ী, আরো মায়াবী মনে হচ্ছে। আর হিমালয়ের কোলে নিঃশব্দে দন্ডায়মান ছায়াময় মন্দিরটিকে 'আশ্চর্য দেখাচ্ছে। সুন্দর শব্দটি যথেষ্ট নয়।' কেদারনাথের মন্দিরটি প্রস্তর নির্মিত। এর পাথুরে স্থাপত্যের মধ্যে রয়েছে একটা 'গুরুগম্ভীর, রাশভারী, austere, শ্রদ্ধানম্র ব্যাপার।' এই মন্দির যেন সাধারণ পুণ্যার্থীদের জন্যই নির্মিত। দলে দলে মানুষ পায়ে হেঁটে সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দেবতার কাছে আসেন। ভগবান যেন এদের জন্যই অপেক্ষায় থাকেন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে সোনা রুপার আধিক্য। প্রাচুর্য তার প্রধান পরিচায়ক। অথচ এখানে তা নেই। আছে কেবল ভক্তি, শ্রদ্ধা। 'এখানে পথশ্রান্তি দূর করতে আছেন হাজির হিমালয় আর কেদারনাথ স্বয়ং।'

রাত্রি গভীর হল। খুলে গিয়েছে কুয়াশার পর্দা। অনাবৃত হয়েছে জোৎস্না ধবধবে তুষারে ঢাকা শৃঙ্গ, যেন—

> "এক সারি দুধেল ঘোড়ার ঘোড়সওয়ার, ছুটে এসেছে অলক্ষ্য থেকে, ঝক্‌ঝকে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের বর্শাফলক তাদের উত্থত মুঠোয়। এই তরল চাঁদের আলো, এই অলৌকিক স্নেহপদার্থ পিছলে যাচ্ছে পেশীবহুল পর্বতের শক্ত শরীরে। সুন্দরী চাঁদ বুঝি এখান থেকে বেশি দূরে নয়, তাকে দেখেই এই প্রতিবেশী সৈন্যদের সর্বাঙ্গে হাসির আভা উথলে পড়ছে এই চোখের কত কী পাওয়া বাকি ছিল সারাদিন। কোথায় লুকিয়ে ছিলে তোমরা, যৌবনদৃপ্ত ধবধবে শিখরশ্রেণী, কোথায় যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছো? চঞ্চল গতিময়তা এখনও সর্বাঙ্গে মাখানো। এমন অসামান্য চমক দেওয়া প্রকৃতির নিজস্ব নাটকেই সম্ভব।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 701 - 712
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> 'স্বপ্নলোকের চাবি' কথাটা শোনাই ছিল, এখন মনে হল কেউ যেন সেটা হাতে পেয়ে খুলে ফেলেছে গোপন দরোজা। হিমালয়ের এই প্রসন্ন হাসিটিই সেই স্বপ্নলোক।"[৯]

কেদারনাথ এমনই সৌন্দর্যময়। এমনই অলৌকিক অপার্থিব রূপ রাশি নিয়ে যুগ যুগ ধরে সে আকর্ষণ করে চলেছে পুণ্যার্থী, পর্যটক, প্রকৃতি প্রেমিক, ভক্ত, ভূতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক — সকলকে। শিবখ্রীষ্ট স্বামীকে লেখিকা ধন্যবাদ জানালেন। তার অনুরোধ ব্যতীত এখানে আসা হত না। আর না এলে এমন অপার্থিব সৌন্দর্য উপভোগ করা যেত না। প্রচন্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে লেখিকা হিমালয়ের সন্ধ্যার মাধুর্যে বিভোর হয়ে রইলেন বহুক্ষণ।

পরদিন সকালে পূজো দিতে যাওয়া হল। এখানেও নানান দামের পূজার ব্যবস্থা। জুতো খুলে খালি পায়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে দেবতার সম্মুখে আসা গেল। এখানে স্পর্শ পূজা প্রচলিত।

> "কেদারনাথের বিগ্রহ বলতে আছে ষাঁড়ের পিঠের কুঁজের আকৃতির একটি কষ্টি পাথরের চাঁই। যেন কচিকাঁচা একটি পাহাড় সবে আকাশের দিকে মাটি ঠেলে উঠতে শুরু করেছিল, হঠাৎ তার মাথার ওপরে মন্দির চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথবা, মাটির তলায় লুকিয়ে আছে এক বৃহৎ ঋষভতার কুঁজটুকুই ভেসে আছে উপরে, এক্ষুণি বুঝি তেড়েফুঁড়ে উঠে আসবে, লণ্ডভণ্ড করে দেবে সাজানো পুজো-পুজো খেলা।"[১০]

কেদারনাথের মন্দির বহু প্রাচীন। এর সঙ্গে জুড়ে আছে মহাভারতের গল্প। গল্পটি এইরকম—

> "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর স্বজন হত্যার মহাপাপ থেকে রক্ষা পেতে তাঁরা শিবের খোঁজে এখানে অবধি তেড়ে এসেছিলেন। শিব পাণ্ডবদের নিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগলেন, কাশী বিশ্বনাথের মন্দির থেকে পালিয়ে এলেন গুপ্তকাশীতে, সেখান থেকে একেবারে দুর্গম কেদারে। সেখানে শিব ষাঁড় সেজে লুকিয়ে রইলেন পার্বত্য গরু ষাঁড়েদের দলে। ভীম তখন দুই পাহাড়ে দুই পা স্থাপন করে শিবের পথ আটকালেন, দেবতা তো মানুষের পায়ের ফাঁকে গলতে পারবেন না। ধরা পড়ে গিয়ে নিরুপায় হয়ে শিব তখন পাতাল প্রবেশ করলেন— কিন্তু 'পালাবি কুথা' বলে ভীমসেন পালোয়ান তাঁকে জাপটে ধরলেন,চিনতে পেরেছি ঠাকুর। তখন পঞ্চকেদারে ফুটে উঠল শিবঠাকুরের পঞ্চ অঙ্গ। সেই ষাঁড়ের পিঠেই এই পুণ্য কেদারনাথের বিগ্রহ যাঁর পুজো করে স্বজনহননের পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন পঞ্চপাণ্ডব।"[১১]

কাহিনিতে সত্য মিথ্যা যাই নিহিত থাকুক, মানুষ অন্তর থেকে এঈ কাহিনি বিশ্বাস করেন এবং সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে দেবতার দর্শনের জন্য ফিরে ফিরে আসেন।

পূজা শেষে আশেপাশের দোকান থেকে কচুরি হালুয়া চা খেয়ে নিল সবাই। এবার নামতে হবে। বিদায় জানাতে হবে কেদারনাথকে। বিদায় বেলা কেদারনাথের সেই অপরূপ দৃশ্য অদৃশ্য। সব ঢাকা পড়েছে মেঘে। মন খারাপ। চারধাম যাত্রা শেষ। ফিরে যেতে হবে যে যার আপন কর্ম জগতে। বারবার ফিরে ফিরে চাইতে হচ্ছে। দেওদেখানিতে এসে শেষবারের মতো দেখা গেল কেদারনাথ মন্দিরের চূড়া।

গৌরীকুন্ডে এসে এক মহাবিপত্তি হল। টাকা পয়সা সবশেষ। অথচ এখনো খরচ খরচা অনেক বাকি। হঠাৎ আবিষ্কার হল একটি খাম ভর্তি পঁচিশশ টাকা। এই টাকাটা শিবখ্রীস্ট স্বামী পিকোকে দিয়েছিল যত্ন করে রাখতে। সন্ন্যাসী যখন আশ্রম তৈরি করবেন, তখন টাকাটা চেয়ে নেবেন। নবনীতা দেবী এ টাকা নিতে চাননি। কিন্তু স্বামীজী বলেছিলেন - "তাহলে ধরে নাও এই টাকাটা তোমার মেয়েকে আমার দানম্।" আজ এই বিপদের কাজে লাগলো। স্বামীজী যেন দেবতার রূপ ধরে নবনীতা দেবীর কাছে এসেছিলেন। তিনিই তো জগত পারাবারের কারিগর, তিনি সকলের জীবন তরী বয়ে নিয়ে চলেছেন।

গাড়ি চলছে ফিরতে পথে। কিন্তু মন পড়ে রইলো হিমালয়ের পার্বত্য পথে। ফেরার সময় দেখা হল যাওয়ার পথে দেখতে পাওয়া এক সাধুজীর সঙ্গে, যিনি পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। যেন একটি বৃত্ত পূর্ণ হল। কিন্তু সাধ পূর্ণ হল না। আবার আসতে হবে, আসতে হবে সমস্ত মায়ার বন্ধন কাটিয়ে, আসতে হবে সেই মহান হিমালয়ের কাছে সম্পূর্ণ

আত্মসমর্পণ করতে। সেই পূর্ণতার চরণতলে আশ্রয় নিলে জীবনের সমস্ত সাধ্য সাধনার নিরসন, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি।

একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সাহিত্য হয়ে ওঠে সাহিত্যিকের রচনার যাদুতে। কেবল দর্শনীয় বস্তুর বিবরণ নয় বরং ভ্রমণ অঞ্চলের বিবরণ, আঞ্চলিক মানুষের জীবন জীবিকার পরিচয় জ্ঞাপন, সেই সঙ্গে লেখকের নিজস্ব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনায় তা হয়ে ওঠে সাহিত্যের পদবাচ্য। 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে' গ্রন্থটি একটি সার্থক ভ্রমণ সাহিত্য। যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী বদ্রীনাথ ও কেদারনাথের যাত্রা পথের বিস্তারিত তথ্যের সঙ্গে রয়েছে পথের মনোমুগ্ধকর বিবরণ। তার পাশাপাশি পথের দুর্গমতা, সীমাবদ্ধতাও উল্লেখ রয়েছে। উত্তরাখণ্ডের চারটি ধর্মস্থান হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র। লেখিকা কেবলমাত্র ভক্ত হৃদয়ের দৃষ্টি নিয়ে এই চারধামে বর্ণনা করেননি বরং যেখানে যেখানে অসঙ্গতি আছে, যেখানে সরকারের উদাসীনতা লক্ষণীয় তাও উল্লেখ করেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি চারধামের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। এই দীর্ঘ যাত্রায় লেখিকা সঙ্গে ছিলেন তাঁর কন্যা এবং ভাই। কতগুলি নিরস বক্তব্যে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণ হয়নি বরং প্রতিমুহূর্তে লেখিকার সরস মন্তব্য পাঠককে সদা সর্বদা রসসিক্ত করে রেখেছে। যাত্রাপথের প্রায় সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য প্রবন্ধে উপস্থিত। অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক পরিবেশ, আঞ্চলিক মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান, খাদ্য সংস্কৃতি সমস্তই লেখকের দৃষ্টিপথে ধরা পড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার বহুল উন্নতির ফলে বর্তমানে এই চারধাম যাত্রা অনেক সহজ হয়েছে সত্য। কিন্তু প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য একই রয়েছে। এখন সাধারণ মানুষ অনেক অল্প পরিশ্রমে সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন। কিন্তু হিমালয়ের মাহাত্ম্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে, দেবতার পায়ে মাথা নত করতে হলে, শ্রমসাধ্য কষ্ট করে সেখানে পৌঁছানো উচিত। তবেই দেবতার আশীষ পাওয়া সম্ভব। প্রাথমিক পর্যায়ে লেখিকার হৃদয়ে ভক্তির কোন নির্ঝর না থাকলেও ক্রমশ তিনি হিমালয়ের রূপ সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে এই মহান সন্ন্যাসীর কাছে আসতে গেলে নিজেকেও সন্ন্যাসীর মত রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে আসতে হবে। তবেই চারধাম যাত্রার সার্থকতা।

Reference:

১. দেবসেন, নবনীতা, 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪৩১, পৃ. ৬৬
২. তদেব, পৃ. ৯১
৩. তদেব, পৃ. ৯৫
৪. তদেব, পৃ. ১০১
৫. তদেব, পৃ. ১০৪
৬. তদেব, পৃ. ১০৫
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ,আশ্বিন ১৩৩৮ পৃ. ২০৪
৮. দেবসেন, নবনীতা, 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪৩১, পৃ. ১১০
৯. তদেব, পৃ. ১২৫
১০. তদেব, পৃ. ১২৮
১১. তদেব, পৃ. ১২৮